কালচিতি

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

কালচিতি গ্রামের নারান হাঁসদা এসে আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেল ওদের গ্রামে যাবার জন্যে।

কালচিতি এখান থেকে পাকা দশ মাইল দূর, ডিবুডুংরি ও সারোয়া দুটি জঙ্গলাবৃত পাহাড় পেরিয়ে তবে। দুর্গম রাস্তা।

যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই চালের বাজার, জিনিসপত্র দুর্লভ বটে, আক্রাও বটে। ভালো দুধ তো দেশ থেকে উঠে গিয়েছে। নারান হাঁসদা ও গ্রামের প্রধান, আমার মক্কেল। তাকে অনেকদিন থেকে বলছিলাম ওদিকে কিছু ধানের জমি পাওয়া যায় কিনা। এবার এসে সে খবর দিল, ত্রিশ বিঘা ভালো জমি এক বন্দে আছে, সেই সঙ্গে একটা ভাল পুকুর ও শাল-মহুয়ার জঙ্গল। দরে সে কিছু সস্তা করে দিতে পারে আমাকে, সে-ইযখন গ্রামের প্রধান।

সেদিন সকালে সে একখানা গরুরগাড়ি পাঠিয়ে দিলে। গাড়োয়ানের হাতে একখানা চিঠি, তাতে লেখা আছে আমি যেন বাড়ির মেয়েদের নিয়ে যাই।

দুপুরে আহারাদির পর কালচিতি রওনা হলাম! মাইল দুই গিয়ে টাউনের সীমা ছাড়লাম। তারপর একটা ঝাটি শালচারার বন সে-ও মাইলখানেক—তার পরেই পড়ল ডিবুডুংরি পাহাড়। পাহাড়ের উপর এঁকেবেঁকে গরুরগাড়িউঠতে লাগল।তখন বেলা দুটো, আদৌ রোদ নেই; মেঘস্নিগ্ধ আকাশতল, অথচ সকাল থেকে বৃষ্টি নেইশুধু ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পাহাড়ের চড়াইয়ে বড় বড় শাল, করম, আসামের ছায়াবহুল জঙ্গল, এক রকমের ছোট বাঁদর খেলা করে বেড়াচ্ছে ডালে ডালে। করম গাছের হলদে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে পাষাণময় পথের ওপর। যেন কে ইচ্ছে করে ছড়িয়ে রেখেছে।

আবার বহুদূর ঢালু পথে গরুরগাড়ি মন্থরগতিতে নামতে নামতে চলে।

গাড়োয়ান মুখে বলছে—ইঃ ইঃ! ডুংরিটা পেরিয়ে জল খাওয়াইয়ে লিব চল—ইঃ। শালের পাঁচন মারছে গরুর গায়ে।

পাহাড় পার হয়ে ঢালু বিস্তীর্ণ পথটা যেখানে সমতলভূমিতে এসে মিশেছে সেখানে একটা পাহাড়ি নদী উপলরাশির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। পার্বত্য নদীর বন্ধুর তটভূমিতে দু'পারেই কুটজ কুসুমের শোভা, চিহড় লতা অজগর সাপের মতো বড় বড় শালগাছের গুঁড়িকে বেষ্টন করে উপরের দিকে উঠেছে। কমব্রিটাম লতার ছোট-বড় ঝোপ একেবারে জল ছুঁয়ে আছে। পক্ষীকাকলিমুখর বড় সুন্দর স্নিগ্ধ উপত্যকাটি। যেন এখানে সংসারের কোনো গোলমাল নেই।রাজাকরদের উৎপাতের কথা শুনতে হয় না সকালে উঠে, ব্ল্যাকমার্কেটের সংবাদ পৌঁছয় না, মানুষের সঙ্গে বিবাদের বার্তা নেই এখানে। গাড়োয়ান বললে—নাম বাপু, জল খাওয়াইয়ে লিব গরু দুটাকে।—আমরা গাড়ি থেকে নেমে একটু দূরে একটা বড় শিলাসনে বসতে যাচ্ছিলাম, গাড়োয়ান বললে, উ ধারে যাবি না আজ্ঞে।

—কেন?

—উ ধারে ভালুক-ঝোড় আছে। ভালুকটা বাহিরাবে—গরু ডরাবে।

ভালুক! পথের ধারেই দিনেরবেলা ভালুকের ভয়! মেয়েরা ভয় পেয়ে গেলেন। আমরা কাছে বসলাম কিছুক্ষণ, তারপর আবার গাড়িতে উঠলাম।

এবার কিছুদূর গিয়ে একটাবন্য গ্রাম পড়ল, নাম কাড়াডোবা। ঘর কুড়ি-বাইশ মুন্ডা খ্রিস্টানের বাস, মকাই ক্ষেতে কাজ করছে মেয়েরা,বাঙালি মেয়ের মতো শাড়ি পরনে। একটি মুন্ডাযুবককে জিজ্ঞেস করলাম—কী নাম আছে?

—পল ।

—ও মেয়ের কী নাম?

—রত্না কুই।

একেবারে আধুনিক নাম—‘রত্ন’। খ্রিস্টান মিশনারিরা ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে অনেকখানি বাইরের আলো দিয়েছে যে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাস্তার দু’ধারে অবস্থিত সারবন্দিওদের বাঁশ-খড়ের ছোট নিচু ঘরগুলির মেঝে ও দাওয়া এলা মাটির রং করা, নিকানো-মোছানো, দেওয়ালের বাইরে ধনেশপাখির ছবি আঁকা, ভালুকের, পাহাড়ের ও ফুলগাছের ছবি আঁকা।

ওদের ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছেলে কোলে করে কৌতূহলের সঙ্গে বন্য মেয়েরা একদৃষ্টে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

একটা বৃদ্ধা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলে—কুথাকার গাড়ি বটে?

—কালচিতি

—কে আসছে সঙ্গে?

—ডাক্তারবাবু বটে।

—হোই।

আবার নির্জন বনপথ। একেবারে নির্জন। সন্ধ্যার পর বন্যহস্তিযূথ এ পথে বর্ষার ধানক্ষেতে নামে পাহাড় থেকে, পথের ধারে নরম মাটির বুকে তাদের পদচিহ্ন এঁকে। সাদা মেঘপুঞ্জ থোলো থোলো জমেছে দূর শৈলমালার শিখরে শিখরে, কালিদাসের দেশের সানুমান আম্রকূটের ছবিমনে জাগিয়ে দেয়। সঙ্গে একখানি মেঘদূত যদিআনতাম, তবে ওই বন্য কূটজবৃক্ষের তলায় পাহাড়ি নদীর পাড়ে পাহাড়ের ওপর পা ছড়িয়ে বসে এমন মেঘমেদুর দিনে স্নিগ্ধ অপরাহ্নে সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের সুখমন্থর দিনগুলির কথা পাঠকরতাম আর শুনতাম ধনেশপাখির ডাক, শুনতাম বনময়ূরের কেকাধ্বনি। শহরের দোতলা ঘরে বৈদ্যুতিক বাতির তলায় ও কাব্য পড়ে কেউ ওর প্রাণস্পন্দন কানে শুনতে পারে না।

অনেকদূর যাবার পরে আর একটা গ্রাম পড়ল, এর নাম ঢেঁড়াপানি। একেবারে সাঁওতালি নাম, যে জায়গা থেকে জল দূরে। বহুব্রীহি সমাস।

এ গ্রামটিও খুব বড় নয়, খুব বড় গ্রাম ও অঞ্চলে বড় একটা নেই। এই গ্রামে একটা দেখবার মতো জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে একটা পাথরের চবুতারা, তার চারদিকে পয়ঃপ্রণালী। বহু পুরনো আমলে এখানে নাকি প্রাণদণ্ডের আসামিদের শিরশ্ছেদ করা হত, রক্ত গড়িয়ে পড়ত ওই পয়ঃপ্রণালী দিয়ে। কে যে কার প্রাণদণ্ড দিত, তা বোঝবার কোনো উপায় নেই—সম্ভবত পুরোনো প্রাকব্রিটিশ যুগের কোনো বন্য রাজা।

ঢেঁড়াপানি ছাড়িয়ে দু’রশি গিয়েই সারোয়া পাহাড়ের চড়াই শুরু হল ক্রমোচ্চ বনপথের মধ্য দিয়ে। এই বর্ষাকালে ছোটখাটো ঝরনা কুলুকুলু রবে এদিক-ওদিক থেকে সরবে নেমে আসছে, দ্রোণঘাসের ফুল ফুটেছে, যে ফুল তীরের মতো বিঁধে যায় কাপড়ে।

এ পাহাড়ে বড় গাছ অনেক বেশি, চড়াইয়ের পথ দুর্গমতর। কিন্তু শোভা সবচেয়ে চমৎকার। উচ্চতা এত বেশি যে, এখানে চড়াইয়ের মাথা থেকে বহু দূরে টাটানগরের ডালমা পাহাড় চোখে পড়ে। চারিধারেই ঢেউ খেলানো পাহাড়শ্রেণি, কোথাও উঁচু কোথাও নিচু—দূরে দূরে পাহাড়গুলো ঘননীল, কালো মেঘের পটে ছবির মতো।

একজন বুড়ো কাঠুরে লুদাম গাছের কাঠ কাটছে পাহাড়ের মাথায়। তার পরনে ইঞ্চি-দুই চওড়া কাপড়ের কৌপীন মাত্র।

জিজ্ঞেস করা গেল—কী নাম রে?

—গনু সর্দার।

—বাড়ি কোথায়?

—ঢেঁড়াপানি।

—তোর বয়েস কত?

—কী জানি বটেক।

—পঞ্চাশহয়েছে?

—পঞ্চাশ হতে পারে, ত্রিশ হতে পারে।

—কী খেয়েছিস?

—নাই খাইল।

—তবুও?

—সোঁধা চাল আর নুন।

অর্থাৎ ভিজে চাল নুন দিয়ে খেয়েছে। এসব বন্য দেশে আটা ছাতু প্রভৃতি খাদ্য একেবারে অচল। এরা ভাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এমনকি তরকারি পর্যন্ত খায় না, হয়তো একটু শাকভাজা আর নুনের টাকনা দিয়ে এক বড় জামবাটি ভর্তি পান্তাভাত দিব্যি মেরে দিলে। তাতেই এদের সবল স্বাস্থ্যবান পাথরে কোঁদা চেহারা, ধনুকবাণ নিয়ে বড় বাঘ ও বুনো হাতি আর ভীষণ বিষধর শঙ্খচূড় সাপের সামনে এগিয়ে যাবে নির্ভয়ে। আর ভালুক? সে তো এদের ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। সন্ধের অন্ধকারে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরে।

আমাদের গাড়ির একটি মেয়ে হাসতে হাসতে বললে— হ্যাঁ গনু সর্দার, তোমার বয়েস পনেরো পর্যন্ত হয়েছে কি?

—তা হতে পারে বটে।

—তাহলে বড্ড বয়েস হয়েছে তোমার!

—হ্যাঁ, রেলটা বসল চাঁইবাসাতে, তখন আমি কাড়া চরাই আজ্ঞে। তুমি আগুন দিলি?

—কী?

আমি বুঝিয়ে বললাম গনু দেশলাই চাইছে। পিকা খাবে। পিকা অর্থাৎকাঁচা শালপাতায় জড়ানো তামাকের পাতা—বিড়ির আকারের বটে, তবে আধ হাত লম্বা। বাজারের বিড়ির চেয়ে পিকা খেতে অনেক ভালো লাগে। এই সব বন্য অঞ্চলের কোনো লোকই বাজারের তৈরি বিড়ি কিনে খায় না।

জিজ্ঞেস করলে বলে—উ উদাস লাগছে রে।

এবার সারোয়া পাহাড় থেকে পথ নামল। ওই পথটা আগের পাহাড়ের উতরাইয়ের মতো অতটা ঢালু নয়। অর্থাৎ রাস্তাটা দিয়ে আরোহী-বোঝাই গরুরগাড়ি নিয়ে নামা একটু বিপজ্জনক। নামবার রাস্তার একপাশে খাদ বেশ গভীর। গরু যদি ভয় পেয়ে একটু এদিক-ওদিক নিয়ে যায়, তবে ওই খাদে আরোহী-পূর্ণ গাড়ির সমাধি সুনিশ্চিত।

ঢালু পথটা যেখানে সমতলে এসে মিলল, সেখানেই কালচিতি গ্রাম। অর্থাৎ সারোয়া পাহাড়ের এপারে ঢেঁড়াপানি আর ওপারে কালচিতি, মাঝখানে পাহাড়টা দাঁড়িয়ে। এই গ্রামটা এদিকের মধ্যে বড়। অনেক ঘর লোকের বাস, এদের মধ্যে অনেক বাঙালি অধিবাসীও আছে। বাঙালি অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ বহুকাল আগে বাঁকুড়া বা মেদিনীপুর জেলা থেকে এসে এখানে বাস করেছিল। এই বনাঞ্চলের পরিবেশের মধ্যেও এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঠিক বজায় রেখে চলেছে।

আমরা নারান হাঁসদার বাড়ি গিয়ে উঠলাম। খড়ের বাড়ি, মাটির দেওয়াল, মাঝখানে বড় একটা চওড়া ঘর, তার চারিপাশে কুঠুরি, শালকাঠের দরজা-জানালা। কোথাও চুন সিমেন্টের বালাই নেই। নারান হাঁসদার মুখে শুনলাম এ ঘর অন্তত সতেরো বছর আগে তৈরি, অথচ মাঝে মাঝে নতুন ছাউনি দেওয়া ছাড়া অন্য

বিশেষকোনো খরচ নেই এর পেছনে। নারান হাঁসদা বাড়ির মেয়েরা এগিয়ে এসে গাড়ি থেকে আমাদের বাড়ির মেয়েদের নামিয়ে নিয়ে গেল। তাদের পরনে ফর্সা শাড়ি, গায়েও ব্লাউজ, এমনি অজ বন্য গ্রামের মেয়েদের তুলনায় অনেক মার্জিত ও সভ্য, এদের কথাবার্তাও ভালো, খানিকটা এ অঞ্চলের বুলি ও টান থাকা সত্ত্বেও ভালো বাংলা বলেই মনে হয়।

নারান হাঁসদা বাঙালি নয়, সাঁওতাল। ওদের বাড়িটা একটু বেশি ভালো, আসবাবপত্রও অনেক রকম আছে, কারণ ও গ্রামের প্রধান, অবস্থাও ভালো।

নারান হাঁসদার মা এসে বললে—ঠাকরাইনরা আসেন ঘরের মধ্যে। গরিবের ঘরে পা দিচ্ছেন, পায়ে জল দেন।

আমি বাইরের ঘরে একটা চৌকির ওপর বসলাম। নারান হাঁসদার ভাই এসে তার ওপর একটা ভালো শতরঞ্জি পেতে দিয়ে গেল।

এতটা পাহাড়ি রাস্তায় এসে শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি গরুরগাড়িতে বেশি উঠিনি, হেঁটেই এসেছিলাম গরুরগাড়ির পাশে পাশে। বালতিতে ঠান্ডা জল ঝরনা থেকে তুলে নিয়ে এল, হাতমুখ ধুয়ে ফেললাম, মাথাও ধুয়ে ফেললাম। শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। সারাদিনের পরে এখন হঠাৎ হলদে রোদ গাছপালার মাথায়, দূর পাহাড়ের মাথায়। বনকুসুমের সুবাসভরা অপরাহ্নটি বন্যবিহঙ্গের কলরবে মুখর। ওদের বাড়ির সামনে মস্তবড় কুসুমগাছ, তার তলায় কাঠের আস্ত গুঁড়ি-চেরা ছালটের বেঞ্চি পাতা। সেখানটাতে গিয়ে বসলাম। ঝিরঝিরে পাহাড়ি হাওয়ায় গ্রামটি বেষ্টন করে দূরে দূরে নীল পাহাড়মালা। অরণ্যের শ্যামশোভা সারোয়া পাহাড়ের সানুদেশে, দু'ফার্লং দূরে পার্বত্য নদীর ধারে ধারে। এ যেন রূপকথার গাঁ—যেখানেঃ

রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটিপারুল কুঁড়ি,
তাহারি মাঝে বাসা।

শহর থেকে অনেক দূরে, পাহাড়ি বনের ধারে, শাল আসান মহুল গাছের ছায়ায় লুকানো আছে রূপকথার গ্রাম। জ্যোৎস্নারাত্রে বনের ফুলের সুবাসে এদের কুটিরের বাতাস মদির করে তোলে, বাঘ-ভালুক উঁকি মারে আনাচে-কানাচে, বনের ময়ূর নৃত্য করে এমনি বর্ষার দিনে কুসুমগাছের ডালে; খুব নিস্তব্ধ, শান্তি ও নির্জনতায় ভরা দিনে এরা গান গেয়ে বেড়ায় গ্রামের মাঠে-পথে। ঝরনার স্বচ্ছ জল তুলে আনে সুঠাম বনবধূরা, কুরচি-ফুল-ফোটা পাষাণপথ বেয়ে রিক্তবৃন্ত করবীর বাঁকা ডালে মাংসল বটের, চাহা, তিতির পাখি উড়ে এসে বসে।

শহরের লোক এ গাঁয়ের সন্ধান খুঁজে পায় না।

নারান হাঁসদার ভাই এসে বললে—বাবু, চা দেব কোথায়? ঘরে আসবেন?

—এখানেই ভালো। বেশ ফাঁকা জায়গা গাছের তলায়।

—পিকা বানাব বাবু? বিড়ি-সিগারেট এখানে মেলে না।

—চমৎকার হবে—বানাও।

ঘটিতে চা এল আর এল তালের পরোটা, গরম ভাজা মুড়ি, তালের ক্ষীর, মর্তমান কলা আর শসার কুচি নুন-নেবু মাখানো। যা কিছু সবই এ গ্রামের, কেবল পরোটার আটা এসেছে বাইরে থেকে। অবিশ্যি চা-চিনিও। খাঁটি দুধের তৈরি তালের ক্ষীরটি অতি উপাদেয় হয়েছিল।

নারান হাঁসদা বিনীতভাবে বললে—আমাদের ইস্কুল দেখবেন? আমার মেয়ে সেখানে মাস্টার—যাবেন?

—নিশ্চয়ই যাব। আমার জানা ছিল না নারান হাঁসদার কোন মেয়ে আবার ইস্কুল মাস্টার।

বললাম—কিন্তু এখনো স্কুল খোলা আছে? বেলা তো বেশি নেই!

—আপনি দেখতে যাবেন বলে খোলা রাখা হয়েছে।

—সে কি! এতক্ষণ বলতে হয়—চলো চলো!

অনেকটা গিয়ে গ্রামের প্রান্তসীমায় ফাঁকা মাঠ ও বনের সামনে খড়ের স্কুলঘর। সে এমন একটি স্বপ্নময় সুন্দর জায়গা যে মনে হল এখানে মাস্টারি করা একটা সৌভাগ্য। স্কুলের মাঠের অল্পদূরেই নিবিড় অরণ্যভূমি শুরু। রাত্রে নাকি স্কুলের রোয়াকে ভালুক এসে বেড়ায়। জারুল ফুল ফুটে আছে অদূরবর্তী বনশীর্ষে, যে জারুল গাছ কত যত্ন করে কলকাতার রাস্তার ধারে মানুষ করা হচ্ছে।

আমি স্কুলের মধ্যে ঢুকতেই ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়াল একসঙ্গে। নারাণ হাঁসদার মেয়ে নার্সদের মতো কাপড় পরে নিচু টুলে বসে ছাত্র পড়াচ্ছিল। বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে; কালো বটে, তবে কুচকুচে কালো নয়, চোখ দুটিতে সরলতা ও ঔৎসুক্যের দৃষ্টি। হাতজোড়া করে নমস্কার করলে, আমিও নমস্কার করলাম। বেশ লাগল মেয়েটিকে।

স্কুলের দেওয়ালে একখানা ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো, তার একপাশে মহাত্মা গান্ধীর ছবি একখানা। একখানা বাংলা ক্যালেন্ডার ঝুলছে তার পাশে। মেঝেতে মাদুর পাতা, তাতে ছাত্রছাত্রীরা বসে; সামনে একটা করে নিচু টুল, তাতে বইপত্তর রাখে।

নারান হাঁসদা বললে—এই আমার মেয়ে, এর নাম সুশীলা।

আমি বললাম—বেশ। আপনি বসুন। আপনার ছাত্রছাত্রীরা কি পড়ে?

মেয়েটি বিনীতভাবে বললে—লোয়ার প্রাইমারি পাঠশালা এটা।

একটি ওরই মধ্যে বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম—কি পড়ো?

—সরল সাহিত্য পাঠ।

—পড়ো তো একটু।...আচ্ছা বেশ হয়েছে—বসো। ভালো পড়েছ।

মেয়েটি বললে—একটা কবিতা শুনবেন?

—নিশ্চয়ই।

আমাকে অত্যন্ত অবাক করে দিয়ে একটি ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলে—

ঐ দ্যাখো মা, আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এলো আলো,
আজকে আমার ছুটোছুটি।
              লাগলো না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন,
              অনেক হলো বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল,
              ফেলে এলেম খেলা।

যে দেশের ঘন বনানী ও পাহাড় অঞ্চলের ক্ষুদ্র সাঁওতাল গ্রামের ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, সে দেশ বাংলা-ভাষী নয় এ অদ্ভুত মন্তব্য কাদের? তারা এসে যেন দেখে যায়।

বোর্ডে একটা ছোট অঙ্ক দিয়ে ওদের কষতে বললে সুশীলা। তারা স্লেটে অঙ্ক কষে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। গান্ধীজীর ছবি দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের বললাম—কার ছবি বল তো?

বড় বড় ছেলেরা সবাই বললে—গান্ধীজীর।

ছোট ছেলেমেয়েরা উত্তর দিলে না।

আমি ওদের খুব উৎসাহ দিলাম লেখাপড়ার বিষয়ে। সুশীলা স্কুলের ছুটি দিয়ে দিলে। আমার স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে নাকি আগামীকালও ছুটি থাকবে।

ছেলেরা তিনবার বললে—জয় হিন্দ! জয় হিন্দ! জয় হিন্দ!

একে একে আমায় নমস্কার করে সবাই স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে উচ্চ কলরব ও হাসি-খুশির ঢেউ তুলে যে যার বাড়ির দিকে চলল।

মেয়েরা দেখি মেয়েদের সঙ্গে খুব জমিয়ে তুলেছে। বেলা গেল, যদিও সুমুখে জ্যোৎস্নারাত, মেঘে ঢাকা আকাশে জ্যোৎস্না বিশেষ সাহায্য করবে না দুর্গম পাহাড়ি পথে। সেই জন্যে নারাণ হাঁসদা বার বার বলতে লাগল—রাত্রে এখানে থাকুন বাবু।

সুশীলা এসে বললে—থাকুন রাত্রে আজ। আপনারা থাকলে বড় খুশি হব।

বললাম—আপনি বরং একদিন আমাদের ওখানে আসুন আপনার বাবার সঙ্গে। আজ ছেড়ে দিন আমাদের। সুশীলা চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ থেকে একটা প্রশ্ন ওকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম, এইবার বললাম—

—আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন?

সুশীলা উত্তর দিল—মেদিনীপুর স্কুল থেকে মাইনর পাশ করেছি। একটা ক্রিশ্চান মিশনে সেলাই আর ইংরিজি শিখেছি কিছুদিন।

—এখানে মাইনে কত পান?

—কুড়ি টাকা?

—স্কুলের লাইব্রেরি আছে?

—সামান্য কিছু বই আছে। রবীন্দ্রনাথের বই কিছু আনব এবার।

—কি বই পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের ?

—কিছুই পড়িনি। আমি যে মিশনে সেলাই শিখতাম, সেখানকার টিচারের কাছে ওঁর অনেক বই ছিল। ওঁর গানের বই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে।

—রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পারেন?

—গান গাইতে জানিনে। কোনো গানই নয়। শুনতে ভালোবাসি। একটা কথা বলব? এঁদের মধ্যে যদি কেউ গান করেন একটি,তবে বড় ভালো হয়।

আমাদের বাড়ির একটি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন। ওরা সবাই খুব মন দিয়ে শুনল।

এবার আমরা বিদায় নিলাম। আসবার পথে ওরা খানিকদূর আমাদের এগিয়ে দিলে, আর উপঢৌকন দিলে সঙ্গে ঢেঁড়স, কুমড়ো, পাতিলেবু, বড় একছড়া মর্তমান কলা, গোটাচারেক পাকা তাল।

সারোয়া পাহাড়ের ওপরে যখন উঠেছি, তখন অস্তদিগন্তের মেঘের নীচে দূরের পাহাড়গুলো ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। একটা চমৎকার ওষধিগন্ধ উঠছে বনলতা গাছপালা থেকে। পাখিদের কাকলি-ধ্বনিতে অধিত্যকার বনানী মুখর হয়ে উঠেছে। একটি পরিচিত পাখির ডাক শুনে খুশি হলাম। সমতল বাংলাদেশের বাঁশবনে, আমবনে, বৈঁচি-ঝোপের পাশে এ পাখি ডাকে—পাপিয়া।

সারোয়া পাহাড় থেকে যখন নামলাম, এপাশে ঢেঁড়াপানি গ্রামের কুটিরে কুটিরে তখন মাটির প্রদীপে মহুয়া বীজের তৈল ও বন-করনজার তৈলের মিটমিটে আলো। কেরোসিন তেল এসব দুর্গম বনাঞ্চলে আদৌ পৌছয় না আজকাল, তার ধারও এরা ধারে না।

ডিবুডুংরি পাহাড়ের আগে সেই বনভূমির মধ্যে দিয়ে অতি সন্তর্পণে মশাল জ্বালিয়ে গাড়িখানা চালাতে লাগল গাড়োয়ান বন্যহস্তীর ভয়ে। অন্ধকার খুব ঘন নয়, মেঘভরা জ্যোৎস্নায় পথ দেখতে কোনো অসুবিধে নেই।

হঠাৎ দেখি সেই নির্জন বনপথে দুজন লোক আসছে, দুটিই মেয়েমানুষ।

বললাম—বাড়ি কোথায় রে?

—উই গাঁয়ে বটে।

—কোন গাঁয়ে?

—ঢেঁড়াপানি।

—এত রাতে কোথা থেকে আসছিস?

—হাটে গিয়েছিলেক, আবার কুথা থেকে আসব বটে!

তা বটে। আজ কালিকাপুরের হাট, মনে ছিল না সেকথা।

এই দুটি মেয়ে যদি এত রাত্রে এই বন্যজন্তু অধ্যুষিত অন্ধকার বনপথে নির্ভয়ে আসা-যাওয়া করতে পারে, তবে আমরা মস্তবড় দুঃসাহসের কাজ কিছু করছি না রাত্রে গাড়ি করে ফিরে।

আগে ভয় যে না হয়েছিল এমন নয়, এখন লজ্জিত হলাম সেজন্যে। তবে এ বনই এদের জন্য, কিছু বোঝে না ওরা বন ছাড়া। স্নেহময়ী জননীর অঙ্কের সমান ওদের কাছে এই পাণ্ডববর্জিত বনাঞ্চল, বাঘ-ভালুক ওদের বাল্যসঙ্গী। আমাদের তা নয়—এইটুকু যা তফাত।